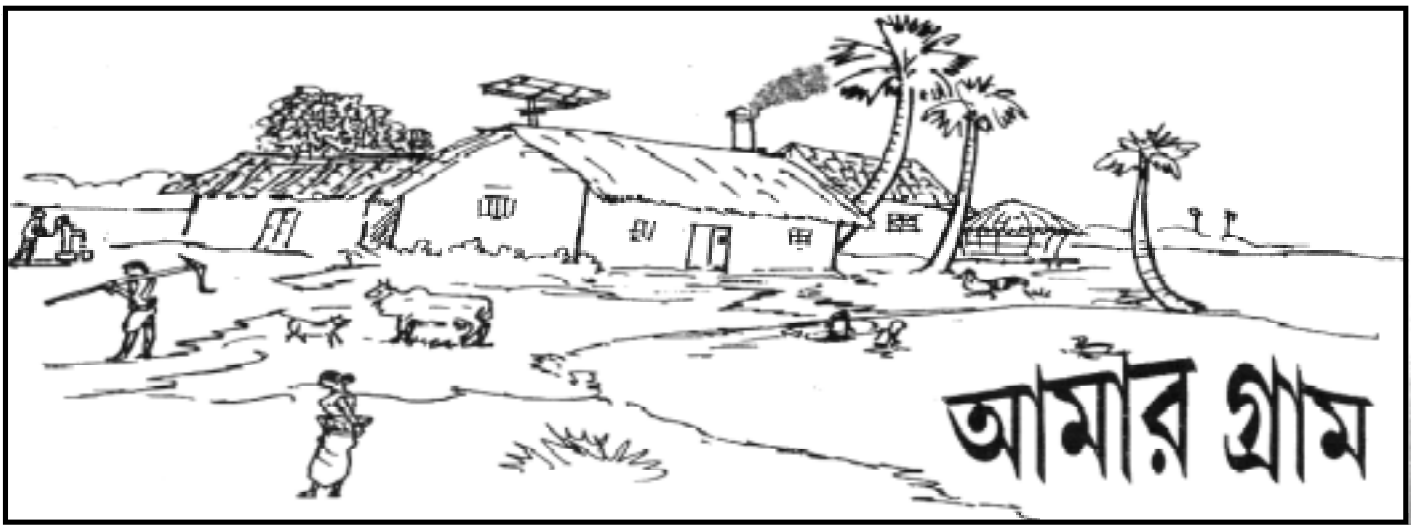

তৃতীয় সংখ্যা | জুলাই - সেপ্টেম্বর, ২০০৯

সম্পাদকীয়

আমাদের দেশ গ্রাম প্রধান। গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রা বহুলাংশেই গ্রামীণ সম্পদের উপর নির্ভরশীল। আজকাল এই সম্পদগুলি যেমন— গাছপালা, জীবজন্তু, মানুষের পরম্পরাগত জ্ঞান, চাষবাস পদ্ধতি ইত্যাদি ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। গ্রামের মানুষ নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে শহরের উপর। এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত দুর্বল হয়ে পড়ছে। তাই গ্রামের উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে হবে। আর এজন্য চাই গ্রামের সম্পদের সংরক্ষণ ও তার সুষ্ঠু ব্যবহার। একাজে গ্রামের মানুষকেই সামিল হতে হবে। গ্রামের মানুষই পারবে গ্রামের সম্পদকে রক্ষা করতে। এজন্য চাই গ্রামকে চেনা, জানা ও ভালোবাসা সর্বোপরি গ্রামকে নিজের বলে ভাবতে শেখা। জানা ও শেখা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

এইসব কথা মাথায় রেখেই '**আমার গ্রাম**' পত্রিকাটি যাত্রা শুরু করেছিল আজ থেকে দুবছর আগে। কিন্তু নানা কারণে তা বন্ধ রাখতে হয়। দ্বিতীয়বার পুনরায় আবার প্রকাশিত হোল নতুন আঙ্গিকে। আপনারা পরিবেশ ও সবুজ বিষয়ক যে কোন প্রস্তাব আমাদের দপ্তরে পাঠাতে পারেন, আমরা আন্তরিকভাবে তা গ্রহণ করব। পাঠকের উপকার হলে তবেই এ পত্রিকা প্রকাশ সার্থক হয়ে উঠবে। সকলকে নমস্কার ও শুভেচ্ছা জানাই।

সম্পাদক মণ্ডলী

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা: জয়নাল আবেদিন, সুবোধ কুমার দাস, সুকেতু মাইতি, সর্বানী শঙ্কর ঘটক, নিশিকান্ত মাইতি, শ্রীমতি প্রথমা রায়, জবেদ আলি, ভাস্কর চন্দ্র দাস, ড. শান্তনু মিত্র।

পত্রিকা কো-অর্ডিনেটর: গৌতম দাস, সুব্রত কর।

কার্যনিবাহী সম্পাদক: অমলেশ মিশ্র ও প্রবীর মাইতি

সহকারী সম্পাদক: অসিত দাস, প্রিয়েন্দু গিরি, তাপসী জানা, দীপঙ্কর জানা, মোহন দোলুই, মমতা পণ্ডিত, শীর্ষেন্দু দাস।

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও সার্কুলেশন: সুধেন্দু চন্দ, উদয় দাস, অনিমা দাস, সোমা দাস।

যোগসূত্র সহায়ক: সাহেবা খাতুন, কৃতিসুন্দর মিশ্র, রবিশংকর দাস।

আন্তর্জাতিক জীব বৈচিত্র বছর— ২০১০

PRA বা সহভাগী গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা জরুরী

তাপসী জানা

আজকাল গ্রামের উন্নয়নের কথা সরকারি এবং অসরকারি স্তরে ভাবনা-চিন্তা চলছে। সেইসঙ্গে সেই ভাবনার সার্থক রূপদানের উদ্যোগও দেখা যাচ্ছে। আবার 'টেকসই' উন্নয়নের কথাও বলা হচ্ছে। কিন্তু উন্নয়ন বলতে কি বোঝায়? খুব সহজভাবে উন্নয়ন বলতে বোঝায় যা আছি, তার থেকে একটু ভালো থাকা ভালো চিন্তা করা। সর্বোপরি সবাই মিলে সকলকে নিয়ে ভালোভাবে থাকা। মনে রাখতে হবে এই উন্নয়ন কেবলমাত্র আর্থিক উন্নতির দ্বারা সম্ভব নয়। আবার উন্নয়ন কার জন্য বা কাদের জন্য এটাও সঠিকভাবে নির্বাচিত হওয়া উচিৎ— এছাড়া সঠিক পরিকল্পনা করা এবং তা বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। যাদের জন্য উন্নয়ন তাদের মতামত, তাদের সহযোগিতা এবং তাদের অংশগ্রহণ অবশ্যই প্রয়োজন। এ কারণেই PRA বা Participatory Rural Appraisal আবশ্যক। অর্থাৎ সহভাগী গ্রামীণ উন্নয়ন পরিকল্পনা, যা বর্তমানে হাতে নিয়েই এগোন হচ্ছে। যদিও বাস্তবে এর সুবিধা তেমনভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে না। সহভাগী গ্রামীণ উন্নয়ন পরিকল্পনায় গ্রামের মানুষের অংশগ্রহণ জরুরী বলে ওই গ্রামেরই শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই কাজে লাগানো উচিৎ।

এই কথাগুলি মাথায় রেখে আমরা পরিবেশ উন্নয়ন পরিষদের উদ্যোগে 'আমার গ্রাম' প্রকল্প রূপায়িত করার জন্য সাগরদ্বীপের উত্তরাংশের পনেরটি গ্রামে PRA পদ্ধতি অবলম্বন করে গ্রামীণ তথ্য সংগ্রহ করে চলেছি। এ উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য আমরা প্রাথমিক প্রশিক্ষণ পেয়েছি ড. দীপঙ্কর সাহা ও তনুশ্যাম ভৌমিকের কাছে। বর্তমানে ড. শান্তনু মিত্রের কাছ থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণ পেয়ে চলেছি। PRA পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রথমে পাখিরালা গ্রাম ও পরে ফুলবাড়ি, কশতলা, ক্ষীরকুলতলা, সাপখালি, চাঁপাতলা, হেন্দলকেটকী ও কচুবেড়িয়া গ্রামগুলির অধিবাসীদের সঙ্গে আলোচনা করে Base Map, Resourse Map, Seasonality, Time line, Economic Lader, Transect Map, Mobility Map, Ranking এবং গ্রামের মানুষের পরম্পরাগত জ্ঞানসংগ্রহ করেছি। এর ফলে গ্রামবাসীদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যেমন সহজ হয়েছে, তেমনি তাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করার পরিকল্পনা করা এবং তা কার্যকরী করা সম্ভব হয়েছে।

পরের সংখ্যায় এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।

দেশজ বীজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও তার গুরুত্ব

সুতপা দাস

আজ থেকে ১০-১২ বছর আগেও শুনেছি বাবা-দাদুরা বিভিন্ন শস্যের যেমন— ধান, গম, সরষে, সব্জী প্রভৃতির বীজ বাড়িতে সংগ্রহ করে রাখতেন, এবং সঠিক সময়ে সেই সংগৃহীত বীজ থেকে ফসল ফলাতেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর ষাটের দশকে ভারতে শুরু হয় 'সবুজ বিপ্লব', অর্থাৎ উচ্চ ফলনশীল শস্যের ব্যবহার। চাষীদের বোঝানো হয়েছিল এই বীজ থেকে কম সময়ে বেশি ফলন পাওয়া যাবে। কিন্তু চাষীদের যা বলা হয়নি তা হ'লো এই চাষে প্রচুর জল, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক লাগে। অধিক পরিমাণ রাসায়নিক ব্যবহার করার ফলে মাটি ক্রমশ অনুর্বর হতে থাকে এবং শেষে বন্ধ্যা হয়ে যায়। সর্বোপরি এই ধরণের শস্যের বীজ সংগ্রহ ও তার সংরক্ষণ করা যায় না। চাষীভাইদের জানানো না হলেও বিভিন্ন গবেষণাকারীর দল এই উচ্চফলনশীল শস্যের ক্ষতিকারক দিকগুলি তুলে ধরতে চেয়েছেন তখন থেকেই। কেউই তেমন গুরুত্ব

না দিলেও, এখন অধিক ফলনশীল শস্যচাষের ফলে তার ক্ষতিকারক দিকগুলি ক্রমশঃ স্পষ্ট হচ্ছে। এই বিপদের কথা এবং ভবিষ্যতের খাদ্য সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নানা উপায়ে চাষী ভাইদের সচেতন করার চেষ্টা করছে এবং দেশী বীজ প্রয়োগ, সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের পরামর্শ দিচ্ছে।

সাগরব্লকে '**আমার গ্রাম**' প্রকল্পের মাধ্যমে দেশীয় বীজ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতির কথা ভেবে একাধিক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। গ্রামের স্বসহায়ক দলের মায়েদের দিয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে দেশীয় বীজের 'বীজভাণ্ডার', পরিবেশ উন্নয়ন পরিষদ দেশজ বীজ দলের মায়েদের পরিমান মত বন্টন করে চাষের পর দুগুণ বীজ ফেরৎ নিচ্ছে। কারণ এই ফেরৎ বীজ আবার পরবর্তী পর্যায়ে অন্য মায়েদের বন্টন করা হবে। এইভাবে একদিকে যেমন দেশজ শস্যের চাষ বাড়বে, তেমনই ভবিষ্যতের জন্য বীজ সংরক্ষিত হবে। যেমন— কোম্পানীচরের 'সূর্যোদয়' দলের স্বপ্না দাস ও অঞ্জলি ঢালীকে ২৫ কেজি করে আলু বীজ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা এই ফসল ঘরে তোলার পর ৫০ কেজি করে দলে ফেরৎ দেবেন। এইরূপ শাক ও অন্যান্য সব্জী বীজ একাধিক স্বসহায়ক দলে দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে ইতিমধ্যে অনেকেই দ্বিগুণ বীজ বীজভাণ্ডারে ফেরৎ দিয়েছেন।

যদি এইভাবে প্রতিটি গ্রামে দেশজ বীজের চাষ ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে একদিকে যেমন দেশজ শস্যের উৎপাদন বাড়বে, তেমনি দেশজ বীজের 'বীজভাণ্ডার'ও সমৃদ্ধ হবে।

সাকিনা বিবির সব্জী বাগান হোল এবার পুষ্টি বাগান

দীপঙ্কর জানা ও সাহেবা খাতুন

সাকিনা বিবি বামনখালি গ্রামের এক সাধারণ গৃহবধূ। স্বামী, দুই ছেলেমেয়ে আর ননদ নিয়ে তাঁর সংসার। স্বামী কাজের তাগিদে বেশির ভাগ সময় থাকেন শহরে। বাড়ির কাজ সামলে অবসর সময়ে সব্জী বাগানে তিনি ননদকে নিয়ে পড়ে থাকেন। এই সব্জীবাগান তৈরির হাতে খড়ি শাশুড়ির কাছে। শাশুড়ি যখন বেঁচেছিলেন তখন শাশুড়ি আর সাকিনা মিলে ডাঙা জমিতে ফলাতেন ঝিঙে, পুঁই, চিচিঙা, ঢেড়স, টক ঢেড়স, খামালু, আলু, বেগুন প্রভৃতি। ডাঙা জমি বলতে বাড়ির পাশে ৬-৭ কাঠা আর পাশে দুটি ছোটো পুকুর।

শাশুড়ির মৃত্যুর পর কাজের চাপে ধীরে ধীরে সাকিনার সব্জী বাগানে আগের মত যথেষ্ট পরিমাণ সব্জীর ফলন হতো না। তাই একসময়ে সেই বাগানে সব্জীচাষ বন্ধ হয়ে গেল। যে সাকিনাদের বাড়িতে কোনোদিন সব্জী কিনতে হ'তো না, এখন বাজার থেকে নিয়মিত সব্জী কিনতে হয়। এমনি করেই দিন চলছিল। কিছুদিন পর সাকিনা তাঁর ননদ সাহেবার কাছে জানতে পারেন 'আমার গ্রাম' প্রকল্পের মাধ্যমে 'সুসমন্বিত রসুই বাগানে'র কথা। যে বাগানে একসঙ্গে নানান ধরণের সব্জী বছরভর ফলানো যায়। সেই সঙ্গে জৈবসার ও কেঁচো সার তৈরির কথা, পুকুরে মাছ চাষের পাশাপাশি হাঁস ও পাড়ে মুরগী চাষ— যা একটির সঙ্গে আর একটির যোগসূত্র তৈরি করেছে— এ কথাও জানতে পেরেছেন। এই পদ্ধতির মাধ্যমে সাকিনা ও সাহেবা নতুন উদ্যমে শুরু করলেন সব্জীবাগান। সেই বাগানে তাঁরা একসঙ্গে ফলাতে শুরু করলেন ঝিঙ্গে, ঢেঁড়স, নানান ধরণের ঋতু ভিত্তিক শাক, আলু, খামালু, লাল আলু, শিম, বিন, বরবটি; লংকা, হলুদ, পেঁয়াজ। এর সঙ্গে কিছু ভেষজ গাছ যেমন— তুলসী, আয়াপান, ঘৃতকুমারী, ভৃঙ্গরাজ প্রভৃতি চাষ করতে লাগলেন। বাজার থেকে কোনো রাসায়নিক সার বা কীটনাশক কিনে প্রয়োগ করেননি তাঁরা। প্রয়োজন মত নিজেদের তৈরি কেঁচোসার, পাতাপচাসার, তরলসার, জৈবকীটনাশক প্রয়োগ করেছেন এই সব্জী বাগানে।

সাকিনা বিবির এই বাগানকে পুষ্টি বাগান বলার কারণ হলো পারিবারিক পুষ্টির কথা ভেবে বাগানটিতে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে পাঁচ ধরণের সব্জীর চাষ করা হচ্ছে, যা সারা বছর ধরেই হয়ে চলেছে। পুষ্টি বাগানের মূল বৈশিষ্ট্য হ'লো অন্ততঃ পাঁচ ধরণের সব্জী ও ফলের চাষ একই সঙ্গে একই জমিতে করা যায়। যেমন—

১) শাক জাতীয়— পালং, মারিশ, পিড়িং, মেথি, সরষে।

২) ফল জাতীয়— বেগুন, ঢেঁড়স, টমাটো, ঝিঙ্গে।

৩) মশলা জাতীয়— লঙ্কা, হলুদ, মৌরি ইত্যাদি।

৪) শুঁটি জাতীয়— শিম, বিনস, বরবটি, অড়হর, বিউলি।

৫) মূল জাতীয়— মূলা, গাজর, বীট প্রভৃতি।

এছাড়া ভেষজ চাষও একই বাগানে একই সঙ্গে করা যেতে পারে।

এই পদ্ধতি মাথায় রেখে সাকিনা তাঁর বাগানে সব্জী চাষের সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী পর্যায়ে চাষের জন্য বীজ সংগ্রহ করতেও শুরু করলেন।

বর্তমানে সাকিনা তাঁর বাগান থেকে যে সব্জী পাচ্ছেন, তা পরিবারের সারা বছরের চাহিদা মিটিয়ে বিক্রিও করছেন। বর্তমানে সাকিনার দেখাদেখি আমিনা খাতুন, হালিমা বিবি, তুলসী ভুঁএ্যা, রীনা গাউনিয়ার মত আরো অনেক গৃহবধূরা তৈরি করছেন এই ''পুষ্টি বাগান''। যদি এঁদের দেখাদেখি গ্রামের অন্য গৃহবধূরাও পুষ্টি বাগান করতে এগিয়ে আসেন, তাহলে একদিকে যেমন পরিবারের সদস্যদের পুষ্টির অভাব মিটবে, তেমনি এলাকার উপযোগী বিভিন্ন জাতের সব্জীর সংরক্ষণও সম্ভব হবে।

জৈব চাষে উৎসাহ দিতে গ্রামে গ্রামে তৈরি হচ্ছে কেঁচো ব্যাঙ্ক

অসিত দাস

আমরা ব্যাঙ্ক বলতে সাধারণতঃ মানুষ যে প্রতিষ্ঠানে টাকা-পয়সা আদান-প্রদান করেন, সেই প্রতিষ্ঠানকেই ব্যাঙ্ক বলে জানি। কিন্তু কেঁচোর জন্য ব্যাঙ্ক তৈরি, আমরা বেশির ভাগ মানুষই জানি না। তবে বর্তমানে কেঁচো-ব্যাঙ্কও তৈরি হচ্ছে। একটু বিস্তারিতভাবে বলা যাক। সবুজ বিপ্লবের পর শস্য চাষে অধিক পরিমাণে ফলন পেতে যেভাবে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগের সূচনা হয়েছিল, আজ সেই রাসায়নিক সার ও কীটনাশক শুধু জমির উৎপাদনই হ্রাস করছে না, সেইসঙ্গে পরিবেশ ও মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভয়ানক ক্ষতি করে চলেছে। সেইসঙ্গে সারের দামও হয়েছে আকাশ ছোঁয়া, যার মূল্য চাষীদের সামর্থ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। অন্যদিকে জৈবসারের বা কেঁচোসারের দাম যেমন তুলনামূলক কম, তেমনি নিজের বাড়িতেই এই সার তৈরি করা যায়। সবচেয়ে বড় কথা এই সার জমিতে ব্যবহার করলে জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি পায়।

পরিবেশ উন্নয়ন পরিষদ রাসায়নিক সারের এই কুপ্রভাবের ফলে তার প্রভাব থেকে চাষীদের মুক্ত করতে এই জৈব ও কেঁচোসার চাষীদের তৈরির ও প্রশিক্ষণ এবং শেষে প্রয়োগের জন্য একটি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। চাষীভাইরা এই পদ্ধতিতে চাষ করলে কেঁচো সার তৈরির প্রশিক্ষণ পরিবেশ উন্নয়ন পরিষদ ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। সেই সঙ্গে কিছু কেঁচো চাষীভাইদের শর্তাধীনে দেওয়ার ব্যবস্থাও করেছে। যেমন কোনো গরীব অথচ উৎসাহী চাষী কেঁচো চাষ বা কেঁচো সার তৈরি করতে চাইলে কোনো একটি গ্রামের পাঁচটি পরিবারকে শুরুতে ৪০০ টি (চারশত) কেঁচো দেওয়া হবে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মত সঠিক পদ্ধতিতে কেঁচোসার তৈরি করতে পারলে প্রথম ছ'মাসে অন্ততঃ ২০০০ (দু'হাজার) কেঁচোর জন্ম হয়ে যাবে। যেহেতু কেঁচোর জন্য পরিবেশ উন্নয়ন পরিষদ কোনো মূল্য নেয়নি, সেজন্য উৎপাদনকারী চাষীকে কেঁচো ফেরৎ দিতে হবে ৬০০ টি। এই ৬০০ টি কেঁচোর মধ্যে আবার ৪০০ (চারশত) টি অন্য চাষীকে প্রদান করা হবে। এইভাবে পরিবেশ উন্নয়ন পরিষদ দু'বছরে সাগরদ্বীপ ব্লকের পনেরটি গ্রামের প্রায় ১২০ জন চাষীকে কেঁচো বন্টন করেছে। যদি এইভাবে কেঁচোসার উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে কেঁচো বৃদ্ধির পরিকল্পনা চাষীভাইরা গ্রহণ করেন, তবে শুধুমাত্র চাষীভাইরা নন অনেক বেকার তরুণ শুধুমাত্র কেঁচোসার উৎপাদন ও বিক্রি করে তাঁদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারেন। এদিক থেকে কেঁচোসার একটি লাভজনক ব্যবসা।

সাগরদ্বীপে বিভিন্ন প্রজাতির মীন সংরক্ষণে ইকোক্লাবের ভূমিকা

সর্ব্বানী শংকর ঘটক

মানুষ জন্মগ্রহণের পর থেকেই শুরু করে তার শিক্ষা। প্রথমে শুরু হয় কিছু প্রাকৃতিক শিক্ষা তার পর জ্ঞানলাভ করে নিয়মমাফিক শিক্ষা যাকে Formal Education বলি। শেষে নিয়মবহির্ভুত শিক্ষা যাকে বলি Non-formal Education. এই প্রথা বহির্ভুত শিক্ষায় (Non-formal Education) অনুপ্রাণিত হয়ে কিভাবে সাগরদ্বীপের Eco-club এর ছেলেরা বিভিন্ন প্রজাতির মীণ সংরক্ষণে এক অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছে তারই একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার জন্য এই লেখার অবতারণা।

সাগরদ্বীপের ভৌগলিক অবস্থানের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, এর উত্তরাংশের নদ/নদী সংলগ্ন গ্রামগুলি হল কশতলা, কচুবেড়িয়া, ফুলবাড়ী, ক্ষীরকুলতলা, সাপখালী, চাঁপাতলা, হেন্দলকেট্টকি, শীলপাড়া, মুড়িগঙ্গা. শিকারপুর, মন্দিরতলা ইত্যাদির এই সময় গ্রামের জনসাধারণের আর্থসামাজিক অবস্থার দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে সমগ্র জনসাধারণের আনুমানিক শতকরা দশভাগ মহিলা ও শিশু উপরোক্ত নদ/নদী গুলিতে চিংড়ির বাচ্চা (মীন) ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। প্রতিদিন গড়ে ৬০-৭০ টাকা রোজগার করে। সাগরদ্বীপের এই সমস্ত নদীগুলোতে সারাবছরই চিংড়ি সহ নানা প্রজাতির মীনে ভরা থাকে। অবশ্যই বর্ষাকালে মীন বেশি থাকে। সেই কারণে মীন সংগ্রহের

কাজ সারাবছর ধরেই চলে। উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল মীন সংগ্রহকারীদের জালে ১৪-১৫ ধরণের মাছের বাচ্চা, অন্য প্রজাতির চিংড়ির বাচ্চা ও ৩-৪ ধরণের কাঁকড়ার বাচ্চাও ধরা পড়ে এবং সেগুলির অধিকাংশই মারা পড়ে।

কিন্তু মাছের বাচ্চা, অন্যপ্রজাতির চিংড়ির বাচ্চা, কাঁকড়ার বাচ্চা সংরক্ষণের জন্য উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে এসেছে সাগরদ্বীপের Eco-club এর ছেলেরা তারা মীনগুলি সংগ্রহ করে বাড়ীতে বড় মাটির পাত্রে (যাকে স্থানীয় ভাষায় মাচলা বলে) মিঠাজলে ছেড়ে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখছে। উদ্দেশ্য হল কোন প্রজাতির মাছ মিঠাজলে বাঁচে এবং কোন প্রজাতির মাছ মারা যায় তা নিরীক্ষণ করা।

প্রাথমিক ভাবে Eco-club এর ছেলেরা ভেটকি, ভাজাতাড়ি। কানা ডোমরা ও আরও ৩-৪ ধরণের মাছ ও চিংড়িকে মাচলার মিঠাজলে মাসাধিক কাল বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছে। পরবর্তী কালে এই সমস্ত মাছ ও চিংড়িগুলিতে মিঠাজলের পুকুরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। লক্ষ করার বিষয় হল যে, Eco-club এর এই অসাধারণ সাফল্যের পর গ্রামের অন্যান্য ছেলেরা অনুপ্রাণিত হয়ে এই ধরণের মীণ সংরক্ষণের জন্য এগিয়ে এসেছে। সামুদ্রিক কাঁকড়ার সংরক্ষণে ও ছেলেদের উৎসাহ দেখার মত।

পরিশেষে এটা বলা যায় ভারতবর্ষ একটি বৃহৎ নদীমাতৃক দেশ। তার জৈব বৈচিত্রও অসাধারণ। এই বৃহৎ নদীমাতৃক দেশের প্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাও জরুরী। এই সংরক্ষণ মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়। তাই এই সংরক্ষণ করতে গেলে আপামর জনসাধারণের অংশগ্রহণ একান্তই জরুরী। বিশেষত যুব সম্প্রদায়ের। সেই কারণে এ জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণের জন্য Eco-club এর মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়ন পরিষদের এই প্রচেষ্টা সাধুবাদের যোগ্য।

ব্যয় ও সুবিধা বিভাজন

অমলেশ মিশ্র ও শান্তনু মিত্র

স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করে ভারতবর্ষের বহু গ্রামে মহিলাদের মধ্যে স্বনির্ভরতা এবং স্বক্ষমতা বেড়েছে। তাদের সামাজিক চেতনা ও সাংসারিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতাও বেড়েছে। তবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে কাজ করার সব থেকে বড় সুবিধা হল ব্যাঙ্ক থেকে সহজে ঋণ পাওয়া যায়। সাধারণত ঋণ দলকে দেওয়া হয় এবং দলের সদস্যরা মিটিং করে দলের সদস্যদের প্রয়োজন মতো টাকা ভাগ করে নেয়। তবে দলের কোন সদস্য যদি ঋণের টাকা পরিশোধ না করে, তাহলে ওই দলের অন্য কোন সদস্য ভবিষ্যতে আর ঋণ পাবে না।

আমাদের দেশের অনেক জায়গায় এই পদ্ধতির সুফল পাওয়া যাচ্ছে। সরকারী তথ্য অনুযায়ী ৯০ শতাংশেরও বেশী ঋণ গ্রহণকারী তাদের ঋণ ঠিক সময় পরিশোধ করে দিয়েছে। এই সাফল্যের কারণ হল স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা পরস্পরকে ভালো ভাবে চেনেন এবং পরস্পরের খবর রাখেন। তাই কারোর পক্ষে ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণ ফেরত না দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। তবে এও দেখা যাচ্ছে বহু জায়গায় দলগুলি তাদের সদস্যদের সঞ্চিত টাকার বেশী ঋণ দিতে আগ্রহী নয়। এর কারণ হল, যদি ঋণ আদায় করা না যায় তবে সদস্যদের সঞ্চিত ধন বাজেয়াপ্ত করা যাবে।

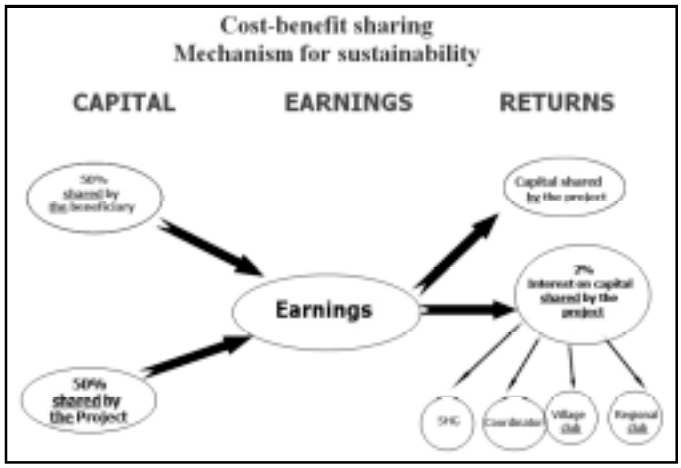

এই পদ্ধতিতে ঋণ দেওয়ার পরিবর্তে আমরা একটি অন্য পদ্ধতির কথা ভেবে কাজ করতে শুরু করেছি। এই পদ্ধতি হল ব্যয় ও সুবিধা বিভাজন করা। ধরা যাক কারোর ব্যবসার জন্য ১০০ টাকা প্রয়োজন। এই ১০০ টাকার মধ্যে ৫০ টাকা নিজেকে জোগাড় করতে হবে ও বাকি ৫০ টাকা পাবে দলের বা ব্যাঙ্কের থেকে (দলের মাধ্যমে)। যখন তিনি ব্যবসায় লাভ করবেন তখন তাকে ঋণ সুদসমেত পরিশোধ করতে হবে। এই পদ্ধতিতে যে সুফল হবে তা হল নিম্নরূপ—

১) যেহেতু যিনি ঋণ নিচ্ছেন তার টাকাও ব্যবসায় সমান ভাগে নিয়োগ করা আছে, তিনি ব্যবসার প্রতি আরও যত্নবান ও আগ্রহী হবেন।

২) যেহেতু ব্যবসায় শতকরা ৫০ভাগ দলের, অন্য সদস্যরাও তার ব্যবসায় সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে।

৩) যেমন দলের টাকাও একজন কোন সদস্যের ব্যবসায় নিয়োগ আছে, একই রকমভাবে তার টাকাও অন্যদের ব্যবসায় নিয়োগ করা থাকবে। অর্থাৎ কেউ কারোর টাকা আত্মসাৎ করার চেষ্টা করবে না।

তবে এই পদ্ধতির একটি বড় অসুবিধা হল যে গরিব সদস্যদের পক্ষে শতকরা ৫০ ভাগ মূলধন প্রথমেই জোগাড় করা অসুবিধা হতে পারে। পরের সংস্করণে "**আমার গ্রাম**" প্রকল্পে এই পদ্ধতি কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তা প্রকাশিত হবে।

কোপেনহেগেন সম্মেলন কার্যত ব্যর্থ

(৭-২০ ডিসেম্বর, ২০০৯)

ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে গত ডিসেম্বরের ৭-২০ পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বিশ্ব সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কোনো ইতিবাচক ঐক্যমত তৈরী হয়নি। তবে একেবারে শেষ মুহূর্তে আমেরিকার সমর্থনে ভারত, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ব্রাজিল (বেসিক গোষ্ঠী) মিলিতভাবে 'কোপেনহেগেন অ্যাকর্ড' নামে একটি খসড়া চুক্তি গ্রহণ করেন। চুক্তি অনুযায়ী, ২০১০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সব দেশকে জানাতে হবে, দূষণ নিয়ন্ত্রণে কে কি লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে। কিন্তু কোনো দেশের জন্যই নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়নি। তাই বলা যায়, 'কোপেনহেগেন সম্মেলন' এক কথায় ব্যর্থ।

কেবলমাত্র 'আমার গ্রাম'-এর সদস্য ও সমর্থকদের জন্য প্রকাশিত। বিনিময় মূল্য- দুই টাকা।

অক্ষরবিন্যাস ও মুদ্রণ: বর্ণনা, ৬/৭, বিজয়গড়, কোলকাতা: ৭০০ ০৩২, ফোন: ৬৪৫১ ৩৩৪২, ৩২৯৬ ৯৭২৫